জেনারেল মইন-এর বই থেকে ওয়ান ইলেভেনের সেই দিন

স্টাফ রিপোর্টার: সদ্য প্রকাশিত জেনারেল মইন উ আহমেদ লিখিত ‘শান্তির স্বপ্নে সময়ের স্মৃতিচারণ’– বইয়ে রয়েছে ওয়ান ইলেভেন নিয়ে নানা তথ্য। এখানে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো: ওয়ান ইলেভেনের পূর্ববর্তী মুহূর্তগুলোতে আমরা একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র তখন কর্মপন্থা নির্ধারণে চরম দ্বিধাগ্রস্ত। চারদিকে এক প্রলয়ঙ্করী নৈরাজ্যের পূর্বাভাস বিদ্যমান। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ দিশাহারা। সকল দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনের প্রত্যাশায় দেশী-বিদেশী প্রায় সকলেই ২২শে জানুয়ারির নির্বাচনের ওপর সমর্থন প্রত্যাহার করলো। এতকিছুর পরেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি অব্যাহত রাখলো। ফলে তখন অবশ্যম্ভাবী সংঘাতময় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। অস্থির এ সময় আমার মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। টেলিভিশনের পর্দায় বিক্ষোভ আর ভাঙচুরের ছবি দেখে আমার মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, কার বিরুদ্ধে আমাদের এ ক্ষোভ? রাষ্ট্রের মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করে কার লাভ? অবরোধের মধ্যে ভাঙচুরের শিকার ট্যাক্সিক্যাবের ভেতর আতঙ্কিত যাত্রীর কোলে ছোট্ট শিশুর আর্তনাদ দেখে আমার মনে হয়েছিল, এ শিশুটির কি অপরাধ? এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর ছিল না আমার কাছে। আর উত্তর ছিল না বলেই গভীর রাত পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে নির্ঘুম যন্ত্রণাময় সময় কাটিয়েছি আর কায়মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি যথাযথ দিক-নির্দেশনার জন্য।

সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তায় দিন দিন দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের হতাশা আরও বাড়ছিল। তাদের অসহায় আক্ষেপ, সেনাবাহিনী কেন চুপ করে আছে? দেশের প্রতি কি তাদের কোন দায়িত্ব নেই? আমাদের এ দুঃসময়ে তারা কি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না? পত্রিকার পাতা ও টেলিভিশনের টকশোগুলোতে সাধারণ মানুষের এ রকম হাজারো আর্তি আমাকে স্পর্শ করলেও আমি ভেবেছি আমাদের কি করার আছে? রাষ্ট্রের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কি করতে পারি? কিন্তু কিছু করার জন্য আমার ওপর চাপ বাড়ছিল। এমনকি আমি সেনাবাহিনীর ভেতরও এক ধরনের হতাশা লক্ষ্য করি। এক সময় ক্ষমতাধর কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করে জানালো, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী সহায়তা করলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য তারা জাতিসংঘকে অনুরোধ করবে। প্রচ্ছন্ন এ হুমকির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনুধাবন করতে আমার অসুবিধা হলো না। জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক এসব দেশের অনুরোধ ও মতামত যে জাতিসংঘ অগ্রাহ্য করতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। আমি এর পরিণাম চিন্তা করে শিউরে উঠলাম। আমার ১৯৭৫-এর ৬ই ও ৭ই নভেম্বরের কথা মনে পড়লো, যখন সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে সিপাহীরা অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমে এসেছিল, সেদিন কোন চেইন অব কমান্ড কাজ করেনি। একবার আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, দেশকে বাঁচানোর জন্য যদি আমি কিছু করি তবে কি তা ম্যাডাম জিয়ার বিরুদ্ধে যাবে? তাহলে কি তা বিশ্বাসভঙ্গের শামিল হবে না? তিনিই তো সেনাপ্রধান হিসেবে আমার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার নিজের মধ্যেই উত্তর পেলাম, দেশ যেখানে ধ্বংসের মুখোমুখি সেখানে অন্য সবকিছুই গৌণ। দেশ থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশের হয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। সেই আস্থার অমর্যাদা আমি করছি না। বরং যদি কিছু করি তবে তা দেশের জন্যই করবো, সেখানে বিশ্বাস ভঙ্গের প্রশ্ন নেই। আমার কাছে প্রথমে দেশ তারপর অন্যকিছু। ডিভিশন কমান্ডারদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত অবগত করতাম এবং তাদের মতামত শুনতাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দ্রুত কিছু করার তাগিদ দিতো। বিশেষ করে সাভার ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী দেশের অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। আমি তাদের বোঝাতাম, রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। ১০ই জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী কাজে সম্পৃক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। সেনাবাহিনী পূর্ব থেকেই জেলা পর্যায়ে মোতায়েন ছিল। সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী কাজে বাধা সৃষ্টিকারীদের কোন পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেয়া হলো। কিন্তু আমি স্বস্তি পেলাম না। আমার মনে হলো রাষ্ট্র এ নির্দেশের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে

দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমার ওপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বিকালে আমার টেলিফোন অপারেটর আমাকে জানালো, জাতিসংঘ থেকে শান্তি মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জন মেরি গুইহিনো আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। আমি বুঝলাম আমাদের শান্তিরক্ষা মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেয়া হুমকি শুধু হুমকিই ছিল না তা বাস্তবে রূপ পেতে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও জাতিসংঘের মনোভাব নিয়ে আমি নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানের সঙ্গেও কথা বললাম। তারাও সবাই একমত হলো, রাষ্ট্রের এ পরিস্থিতি মহামান্য প্রেসিডেন্টকে অবগত করে তার দিক-নির্দেশনা চাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য সময় চাইলাম। প্রেসিডেন্টের এমএসপি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আমিনুল করিম জানালো, প্রেসিডেন্ট ১৪:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে একটি মিটিং-এ ব্যস্ত থাকবেন। ১৫:৩০ ঘটিকায় দেখা করার জন্য আমাদের সময় দেয়া হলো। ঠিক হলো আমরা তিন বাহিনীর প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও এবং ডিজিএফআই-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী (ডিজি, ডিজিএফআই তখন একটি সরকারি সফরে বিদেশে অবস্থান করছিল) এক সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলবো। আমাদের অনুরোধকে বিদ্রোহ ভেবে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করছি বিবেচনা করে ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি নিরাপত্তা কর্মীদের দিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারেন, এমনকি তার জীবনের প্রতি হুমকি বিবেচনায় হত্যার নির্দেশও দিতে পারেন, সেনাপ্রধানের পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে পারেন, জটিল এ পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে তিনি অসুস্থতার ভান করতে পারেন কিংবা হয়তো মানসিক চাপের কারণে সত্যিই তিনি অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন (প্রেসিডেন্টের নাজুক শারীরিক অবস্থার বিষয়ে আমরা সবাই অবগত ছিলাম)। আবার এমনও হতে পারে সবকিছু শুনে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে তিনি যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। বঙ্গভবনে রওনা হওয়ার পূর্বে আমি সিজিএস মেজর জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া'কে ডেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করলাম। আমি ফিরে না এলে পরবর্তী পরিস্থিতি সিজিএস হিসেবে প্রাথমিকভাবে তাকেই সামলাতে হবে। আমি সিজিএসকে বললাম, প্রেসিডেন্ট যদি আমাদের সুপারিশ মানতে রাজি না হয় তাহলে আমাকে বেসামরিক পোশাকে দেখতে প্রস্তুত থেকো। বঙ্গভবনে রওনা হওয়ার সময় আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন আমার পিএস কর্নেল ফিরোজ হাসান সঙ্গে এস্কর্ট নিয়ে যেতে অনুরোধ করলে আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, জন্ম-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। আমি তাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে ১৪:০০ ঘটিকায় সেনাসদর থেকে বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা করলাম। আমার সঙ্গে গাড়িতে শুধু আমার এডিসি ক্যাপ্টেন মাহমুদ। কাকতালীয়ভাবে আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বঙ্গভবনে প্রবেশ করলাম। এমএসপি আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর পর জানালো, প্রেসিডেন্ট লাঞ্চে আছেন। আমাদের এপয়েন্টমেন্টের সময় পেতে একটু দেরি হতে পারে। আমরা সবাই পাশের একটি কক্ষে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পিজিআর ও এসএসএফ সদস্যদের টানটান উত্তেজনা। সব যেন কেমন থমথমে। মনে হলো, এ যেন বিধ্বংসী এক ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত। ইত্যবসরে আমরা তিনবাহিনী প্রধান সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের ভেতর আলোচনা করে নিলাম। নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর বিকাল চারটায় বঙ্গভবনের ভেতরের বসার ঘরে আমাদের ডাক পড়লো। আমরা সবাই প্রেসিডেন্টকে স্যালুট করে তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজ নিলাম। তারপর শুরু হলো আলোচনা। আমি প্রেসিডেন্টকে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি, নির্বাচন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের আলটিমেটাম, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান বিশেষ করে নির্বাচনের ব্যাপারে জাতিসংঘের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানালাম। জাতিসংঘ মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হলে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানও নিজ নিজ অবস্থানে থেকে প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে সচেষ্ট হলেন। ডিজিএফআই-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী গোয়েন্দা দৃষ্টিকোণ থেকে ২২শে জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে অগ্রসর হলে দেশ যে ধরনের সহিংসতার মুখোমুখি হতে পারে তার বর্ণনা দিলেন। আমি মহামান্য প্রেসিডেন্টকে দেশকে এ মহাসঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা করতে কিছু করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানালাম। আলোচনার মাধ্যমেই বের হয়ে এলো সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সম্মুখে তিনটি পথ খোলা আছে। প্রথমত, বর্তমান পরিস্থিতির ভেতরই নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করা যদিও সকল দল

অংশগ্রহণ না করায় এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সেক্ষেত্রে দেশকে অচিন্তনীয় এক সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করতে হলে সেনাবাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সর্বোপরি অগ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহারের ঝুঁকি এবং এর ফলে সামরিক বাহিনীতে বড় ধরনের কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কাও থেকে যাবে। দ্বিতীয়ত, দেশে সামরিক আইন জারি করে সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেনাবাহিনীও সামরিক আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে এবং বর্তমান বিশ্বে সামরিক আইনের গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে। তাছাড়া, সামরিক আইনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশ সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। তৃতীয় এবং শেষ উপায় ছিল দেশে সংবিধান সমুন্নত রেখে জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সার্বিক বিবেচনায় আমরা সকলে জরুরি অবস্থা জারির পক্ষে আমাদের যুক্তি তুলে ধরলাম। মহামান্য প্রেসিডেন্ট আমাদের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। আমি স্পষ্ট অনুভব করছিলাম প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিকই অনুধাবন করতে পারছেন তবে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, এজন্যই সময় নিতে চাইছেন। আমি জানতাম ইতোপূর্বে উপদেষ্টা পরিষদের অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত অজানা কোন কারণ ও প্রভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। যার কারণে আমরা কোন দুষ্টচক্রকে আবার নতুন কোনো খেলা শুরু করার সুযোগ দিতে চাচ্ছিলাম না। একসময় আমরা সবাই প্রেসিডেন্টের কথা শোনার জন্য নিশ্চুপ হয়ে থাকলাম। কক্ষে নেমে এলো সুনসান নীরবতা-একটি পিনপতনের শব্দও বুঝি এখন শোনা যাবে। আমি জানি এটাই সেই মুহূর্ত। এই মুহূর্তেই নির্ধারিত হবে দোদুল্যমান দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের ভবিষ্যৎ। আমার মনে হলো আমাদের চোখ দিয়ে পুরো দেশ যেন তাকিয়ে আছে প্রেসিডেন্টের দিকে। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে প্রেসিডেন্ট একসময় সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারির পক্ষে মত দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ তিনি ভেঙে দেবেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় রাত এগারোটা থেকে সান্ধ্য আইন জারি করা হবে। প্রেসিডেন্ট রাতে জাতির উদ্দেশে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ভাষণ দেবেন। আমাদের বুক থেকে যেন একটা জগদ্দল পাথর সরে গেল। আমরা যখন প্রেসিডেন্টের রুম থেকে বের হয়ে এলাম তখন সন্ধ্যা ৬টা। বুঝতেই পারিনি সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। দেখলাম বঙ্গভবনের কনফারেন্স রুমে তখন আরেকটি মিটিং-এর জন্য উপদেষ্টারা জড়ো হয়ে আছেন। আমরা বঙ্গভবন ছেড়ে আসার পর জরুরি অবস্থা সংবলিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। আমি সিজিএস-এর সঙ্গে কথা বলে জরুরি কিছু নির্দেশিকা দিলাম। সেনানিবাসে ফেরার পথে দেখলাম অনেক উৎফুল্ল মানুষ আমার গাড়ি দেখে আনন্দে হাত নাড়ছে। জরুরি অবস্থা জারির খবর কিভাবে যেন সবাই জেনে গিয়েছে। তাদের এই আস্থাই আমাদের শক্তি। এই আস্থাকে কোনোদিনই আমি ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না। আমি সেনা সদরে পৌঁছেই জ্যেষ্ঠ অফিসারদের নিয়ে কনফারেন্স করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করলাম। প্রতিক্রিয়াশীল কোন শক্তি যাতে কোনো রকম সহিংস ঘটনা ঘটাতে না পারে সে জন্য সেনা টহল বাড়ানোর নির্দেশ দিলাম। আমি স্পষ্ট করে সবাইকে জানালাম, দেশে সামরিক আইন জারি করা হয় নি এবং দেশের সংবিধান সমুন্নত আছে। আমরা বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় নিয়োজিত আছি মাত্র। আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করে রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা। রাষ্ট্র তার নিজস্ব গতিতে চলবে। কোনোভাবেই আমরা রাষ্ট্রের কাজে বাধা সৃষ্টি করবো না বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করবো না। সেনা সদরে আসার পর আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. মোখলেছুর রহমানের ফোন পেলাম। সে জানালো, জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের স্ক্রিপ্ট সে ঠিক করে দিয়েছে। একটু পরেই তা অন এয়ার হবে। আমি তার কথায় একটু অবাকই হলাম। পরিস্থিতির কারণে জনাব মোখলেছ খুব দ্রুতই তার চরিত্র বদল করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করলো। আমাদের সামনে তখন অনেক কাজ। সবচেয়ে বড় কাজ হলো নিরপেক্ষ ও সর্বজনবিদিত একজনকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচন করা যিনি জটিল এ সময়ে আমাদের নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা

রাখে। এ ব্যাপারে সবার আগে সদ্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. ইউনূসের নাম প্রস্তাব করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনূস অথবা ড. ফখরুদ্দীনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। আমারও মনে হলো দেশে ও বিদেশে গ্রহণযোগ্যতার কারণে নিশ্চিতভাবে ড. ইউনূস এ পদ গ্রহণে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অনুরোধ করে সব রকমের সহায়তার নিশ্চয়তা দিলাম। তবুও তিনি রাজি হলেন না। তিনি বললেন, বাংলাদেশকে তিনি যেমন দেখতে চান সে রকম বাংলাদেশ গড়তে খণ্ডকালীন সময় যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশকে তিনি আরও দীর্ঘ সময় ধরে সেবা দিতে আগ্রহী। ড. ইউনূস অস্বীকৃতি জানানোর পর ড. ফখরুদ্দীনের নাম উঠে আসে। মেজর জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ড. ফখরুদ্দীনের বাসায় যান এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেন। তখন গভীর রাত। আমি ড. ফখরুদ্দীনের বাসায় ফোন করলাম। তিনি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমিও তাকে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনি তার স্ত্রী'র সাথে আলোচনা করার জন্য কিছুটা সময় চাইলেন। প্রায় আধঘণ্টা পর তিনি ফোন করে তার সম্মতির কথা জানালেন। এরপর আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম। ঠিক হলো ১২ই জানুয়ারি তিনি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন। এরকম নাটকীয়তা, অনিশ্চয়তা এবং ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখের ঘটনাবহুল দিনটি শেষ হলো। যাকে আমি নাইন ইলেভেনের অনুকরণে নাম দিয়েছি 'ওয়ান ইলেভেন'। নাইন ইলেভেন যেমন আমেরিকা তথা পুরো বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল তেমনি ওয়ান ইলেভেন নাড়া দিয়েছিল পুরো বাংলাদেশকে। দেশের ইতিহাসই এ দিনটির সফলতা কিংবা ব্যর্থতা বিচার করবে। কিন্তু ঘটনার দিনটির আবির্ভাব ছিল সময়ের দাবি। আমরা সে দাবিকে পূরণ করেছি মাত্র। ১২ জানুয়ারি, সকাল এগারোটার দিকে তেজগাঁও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা (নির্ধারিত) ড. ফখরুদ্দীন আহমদ-এর সাথে আমরা এক বৈঠকে মিলিত হলাম। দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয় ঠিক করতে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হলো। আলোচনার মাধ্যমেই বের হয়ে এলো সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য যা যা করা দরকার তার সবই আমাদের করা উচিত। জাতি আমাদের সামনে যে সুযোগ উপস্থাপন করেছে তা কাজে লাগিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়াটাও আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমাদের করণীয় হওয়া উচিত একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, দেশের অর্থনীতিকে সচল করা এবং দেশকে দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে মুক্ত করা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম জাতিকে যতদ্রুত সম্ভব একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়ার মধ্যে আমাদের যাবতীয় কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে। এ সময়ের ভেতরই আমি দ্রুত হিসেব করে দেখলাম এ কাজগুলো করতে আমাদের প্রায় দু'বছর সময়ের প্রয়োজন হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এ দু'বছর হবে আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পরপরই উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের তোড়জোড় শুরু হলো। প্রধান উপদেষ্টা এ ব্যাপারে আমাদের সহায়তা চাইলেন। বেসামরিক পরিমণ্ডলে প্রথিতযশা কৃতী মানুষদের ব্যাপারে আমার জ্ঞান ছিল সীমিত। এ সময়ে দেশের গোয়েন্দা বিভাগ ও সাভার ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে সর্বাত্মক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে। সাভার ডিভিশনের জিওসি দীর্ঘদিন ডিজিএফআই-এ কর্মরত থাকার সুবাদে তার মতামত এ পরিষদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এ পদ গ্রহণে সম্মত কিনা তা জানার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলো। কারণ শুধু আমরা চাইলেই যে সকলে উপদেষ্টা হতে রাজি হবে ব্যাপারটি এমন ছিল না। তাদের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে কাণ্ডারি হিসেবে তাদের অনেক ঝুঁকি নিতে হবে, অনেক অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এমন অবস্থায় উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে সারাজীবনের অর্জনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলার আশঙ্কার মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সেই বিবেচনাতেই হয়তো তালিকার বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা হতে তাদের অসম্মতি জানালেন। যারা সম্মতি জানালেন তাদের নিয়েই উপদেষ্টা পরিষদ চূড়ান্ত হলো। ঠিক হলো ১৩ জানুয়ারি একসাথে সবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। জরুরি অবস্থা জারির দুই দিনও পার হয়নি এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেলো তদবির আর অনৈতিক সুবিধা পাওয়ার কারসাজি। জানা-অজানা, দেশী-বিদেশী অনেক সূত্র থেকে উপদেষ্টা পদের

জন্য লবিং শুরু হয়েছিল যার কারণে এতো সতর্কতার সাথে নির্বাচিত তালিকাকেও এমন কিছু নাম ঢুকে পড়লো যারা উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। এমনকি আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছিল। এ তথ্য আমাকে ভীষণ মর্মাহত করলো। আমার কাছে দেশের প্রয়োজনটাই ছিল সবচেয়ে বড়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান এবং নিকট ভবিষ্যতে তা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই দেখে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী গডফাদাররা নানান উপায়ে দেশত্যাগের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করলো। অবস্থা দেখে সরকার বিমানবন্দর এবং দেশের সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করলো। রাষ্ট্রের আশ্বাস পেয়ে সরকারি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও তৎপর হয়ে উঠলো। রাজনৈতিক চাপ না থাকার কারণে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলো। দীর্ঘদিন যাদের আইনের আওতায় আনা যায়নি বা আইন মানতে বাধ্য করা যায়নি, জরুরি আইনকে অবলম্বন করে তারা তা করতে উদ্যোগ নিলো। ফলে দীর্ঘ নিদ্রার পর দেশ যেন জেগে উঠলো। সর্বত্র সংস্কার আর আমূল পরিবর্তনের দাবি উঠলো।